KATHBURO

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED

MATERIAL

কাঠ বুড়ো

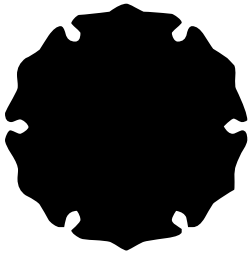

গার্গী ভট্টাচার্য

আমার জীবনের প্রথম বন্ধু, সুনুকে

Believe in your heart that you're meant to live a life full of passion, purpose, magic and miracles."
– **Roy T. Bennett**, **The Light in the Heart**

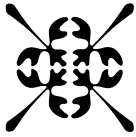

এই বইটি শুরু করার আগে সুনুর কথা বলি।

আমার জীবনের প্রথম বন্ধু ছিলো সুনু। পরে একসাথে স্কুলে পড়েছি। পরবর্তী কালেও যোগাযোগ ছিলো কারণ ওরা আমাদের বাড়ির পাশেই থাকতো। বিয়ের পরে দেখলাম আমার এক ননদিনীর প্রতিবেশী এই মেয়েটি। আমি যখন খুব ছোট তখন আমার পাড়ায় বন্ধু ছিলো না। আমার বয়সী মেয়ে বা ছেলে ছিলো না কেউ। স্কুলে বন্ধু ছিলো। সুনু আর আমার বাসার মাঝে ছিলো এক বিরাট জলাশয়। এই কূলে আমি আর ঐ কূলে- ও ! আমি ওকে হাত দিয়ে ডাকতাম। ও-ও আমাকে ডাকতো। কিন্তু জলের ভান্ডার পেরিয়ে কেউ কারো কাছে যেতে পারতাম না। ওর মা হাসপাতালের মেট্রন ছিলেন। আমার মা ফিজিসিস্ট। কাজেই কর্মরতা মায়ের দুই সন্তান আমরা, দুজনেই জয়েন্ট ফ্যামিলিতে মানুষ। তাই দুপুরে হয়ত দুজনেই একা হয়ে যেতাম। সবাই যখন ভাত ঘুম দিতো।

কী করে আমি ওকে- দৈহিকভাবে প্রথম আবিষ্কার করলাম তা আর আজ মনে নেই । শুধু মনে আছে যে আমার জীবনের প্রথম বন্ধু সে আর আজও সে আমার এক ননদিনীর প্রতিবেশী । কলকাতায় থাকলে নানান অনুষ্ঠানে, আমি ওকে আবিষ্কার করি ।

এখন আবার আমাদের মাঝে সুবিশাল জলের ভান্ডার । কারণ ও কলকাতায় আর আমি ক্যানবেরায় !!!

আমার মোবাইল ফোন নেই; আর ফেসবুক, টুইটার কিংবা ইন্সটাগ্রাম নেই। তাই আমার ফিজিক্যাল ফর্মের থেকে আবার ও অনেক দূরে ।

মনে মনে আছে --- হৃদয়ের কাছে ।।।

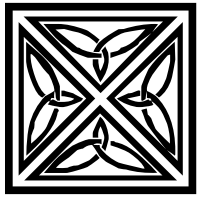

প্যানোরমা ডকুমেন্টারি, বাংলাদেশ- এই চ্যানেলের কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ । তাদের তথ্যবহুল ও ইউনিক্ সমস্ত ভিডিও দেখে দেখে, আমি মানবজীবনের, জমিনের - গভীরতার হদিস্ পেয়েছি । পেয়েছি নানান তথ্য ও জেনেছি তত্ত্ব । অনেক চরিত্র এই ভিডিও দেখে তৈরি করেছি । অনেক তথ্য ও তত্ত্ব ব্যবহার করেছি আমার গল্পে । এর জন্য আমি ওঁদের কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী ।

আমি আদতে বাংলাদেশের মেয়ে । ঢাকা আমার পৈত্রিক ভিটে । এমন লাবণ্যে ভরা আমার বাপ্‌দাদার ভিটে- তা আমি জানতাম না । প্যানোরমার কল্যাণে জানতে পেরেছি আর মুগ্ধ হয়েছি ।

ধন্যবাদ । ধন্যবাদ । ধন্যবাদ ।

-আমারে একটু পান্তাভাত দিবা ? শুঁটকি লাড়া দিয়া ? কত্তোদিন খাইনাই !

শিস্ দিয়ে কথা বলা গোষ্ঠী আছে আর মানব দেহের অঙ্গের নামে অক্ষর-ও সত্যি সত্যি আছে।

কাঠ বুড়ো

জয়সুধা আর সুনেত্রা, মা ও মেয়ে। জয়সুধা যেই দেশের মেয়ে সেই দেশ ফোমোতে কেউ কথা বলেনা। সবাই শিস্ দিয়ে কমিউনিকেট করে। আর মেয়ে সুনেত্রার,পরবাসে গিয়ে অক্ষর জ্ঞান হয়েছে। তবে সে যেই গোষ্ঠির সাথে আছে তাদের ভাষা,অক্ষরে, মানবদেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদির নামে অক্ষর আছে।

সবাই শিস্ দিয়ে কথা বলে বলেই হয়ত অক্ষর নেই ওদের। তাই সুনেত্রা ওর মাকে ভাষা লিখতে শেখায়। পরে রোজ একটা করে গল্প বলে ও মাকে লিখতে অনুরোধ করে।

এরকম এক গল্প হল কাঠ বুড়ো । এই গল্প সুনেত্রার নিজস্ব রচনা হলেও পরবর্তী জীবনে নতুন দেশ ল্যাম্‌ডা-তে গিয়ে ও এক পরিবারের সাথে পরিচিত হয় যাদের জীবন পুরোপুরি কাঠবুড়োর সেই গল্পের সাথে মিলে যায় । খুব অবাক হয় সুনেত্রা । শর্টে সিনা । মাকে জানায় । মা বলে যে দুনিয়ায় এমন অনেক কিছু ঘটে যার কোনো যুক্তি গ্রাহ্য ব্যাখ্যা মেলেনা । গল্পের প্রতিটি চরিত্র একইভাবে রয়েছে । খুব অদ্ভুত তাই না ?

ফোম্মো নামের এই ছোট্ট দেশটিতে ল্যাম্‌ডা দেশের লাবাং প্রজাতির মানুষ শাসন করতে শুরু করে । ওদের অক্ষর আছে । ভাষা বেশ উন্নত । দেহের নানান অর্গ্যানের মতন নাম দিয়ে পূর্ণ ওদের অক্ষর মালা ।

ওদের মধ্যে কবি আছে । চিত্রকর আছে । বুদ্ধিজীবি ও মসীজীবী মানুষের ছড়াছড়ি ।

আজও ওদের দেশে রাজা আছে । সেই বৃদ্ধ রাজাকে দেখতে প্রতি বছর শীতে ওরা ময়দানে জমা হয় । বয়সের ভারে ঝুঁকে পড়া নরেশ আসেন আশীর্বাদ দিতে ও নিতে ।

আজও ওখানে রাজপরিবার বিশেষ সম্মান পায় ।

সুনেত্রা, তার মাকে এই ঘটনা - চিঠি দিয়ে জানায় । সেই চিঠি বা ইমেল আমি এখানে তুলে ধরছি । ওর মা, নতুন নতুন অক্ষর শিক্ষা পেয়ে, ইমেল লিখতে পেরে খুব খুশি হয় কারণ ভুলগুলো সহজেই মুছে আবার লেখা যায় ।

মাকে; একটি স্লেটের মাধ্যমে লেখাজোকা শেখায় , সুনেত্রা বা সিনা । মা জয়সুধা বা সুধা চটপট্ শিখে নেয় অক্ষর মালার নক্শা ! তারপর যেকোনো বিদ্যা নতুন অর্জন করলে যা সবারই হয় তাই হয় এইক্ষেত্রেও । মা সমানে ইমেল পাঠাতে থাকে মেয়েকে । মেয়েও উত্তর দেয় । এইভাবেই এই কাহিনীর সৃষ্টি হয় । মাই ডিয়ার মম্মি বা হ্যালো সিনা , ইতি তোমার মা-- এইসব না দিয়ে আমি সোজাসুজি লেখাগুলো নিয়ে এলাম । ইচ্ছে ছিলো এই বই রোমান হরফে লেখার । বেঙ্গলিশ ভাষায় । কিন্তু পাঠকের মনোমত হবে কিনা তা আমি জানিনা । তাই বাংলায় লিখলাম । সত্যি সত্যি রোমান হরফে লিখতে পারলে খুশি হতাম আর সার্থক হতো আমার শেষ - বই লেখা । বেশ নতুন ধরণের তাই না ?

ফোম্মো দেশে বহুবছর ক্রীতদাস হয়ে ছিলো সুনেত্রারা। পরে এক লাবাং যুবকের হাত ধরে সে চলে যায় ল্যাম্ডা দেশে। সভ্য দেশ ল্যাম্ডা।

এই যুবক আসলে অসভ্য ফিউম লোকেদের জন্য কিছু ভালো কাজ করতে শুরু করে। ফোম্মো দেশের ফিউম লোকেরা দলে দলে স্লেভ হয়ে ল্যাম্ডা আর অন্যান্য দেশে পাড়ি জমায়। কিন্তু ওদের মঙ্গলের জন্যেও কিছু লাবাং মানুষ ভাবতে শুরু করে। এর মধ্যে একজন হল যশবন্ত। সে নাকি আদতে ভারতের লোক। বহু বছর আগে ওরা ল্যাম্ডাতে আসে। যশবন্তকে, লাবাং-রা যোশিমিটি নামে ডাকে। কেন কেউ জানেনা। ওরা একটু লড়াকু ধরণের। পাঞ্জাবী মানুষ তো!

সে যাইহোক্ যোশিমিটি বা যোশ্ স্থির করে যে ক্রিপটো কারেন্সি দিয়ে যে এত শত উন্নয়ন হচ্ছে, লোকে হঠাৎ করে ধনী হচ্ছে, লোকের অবস্থা ফিরে যাচ্ছে অতি অল্প টাকা এতে মূলধন হিসেবে দিয়ে সেই ব্যাপারটাতে কমন ম্যানকে আনলে ওরাও অনেকে লাভবান হবে। খুবই কম টাকা দিয়ে অনেকেই তাদের দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবে। কম কথা নয়। তাই সে ক্রিপটো কারেন্সির ম্যাজিককে সাধারণ মানুষের মাঝে নিয়ে আসে। কিন্তু এতে বেঁকে বসে ল্যাম্ডা দেশের নেতাগণ। যাদের ওরা

চিরটাকাল স্লেভ করে রেখেছে তাদেরই হঠাৎ করে এত উন্নয়ন করা ওদের পলিসির বিপক্ষে । আর এগুলো হল ছোটলোক । নেড়ি কুত্তার বংশ । শুয়োরের বংশ । গাধার বংশ । এরা এত অর্থ পেয়ে বিপথেই যাবে । কোনো কালচার নেই এদের । কাজেই ম্যাজিক দেখিয়ে কোনো লাভ নেই । এরা জন্মেছে পদদলিত হবার জন্যই । লাবাং যুবক মানে আদতে ভারতের লোক যোশিমিটি এদের লোভ দেখিয়ে ভুল করছে । তাই লাবাং গোষ্ঠির সভ্য রাজা , যোশিমিটিকে তাদের দেশ ল্যামডাতে ফিরিয়ে নিয়ে যায় । সেই সময় ওর সাথে পরবাসে পাড়ি দেয়, সুনেত্রা । মানে ইলোপ করে । যোশিমিটির পরিবারের লোক ওকে গ্রহণ করেনা । যথারীতি । ও একাই থাকে । মাকে ইমেল করে । আর অবসরে নানান লেখালেখি করে । যোশিমিটি তো শিস্ দেবার সাথে লিখতেও পারে । পড়তেও পারে । এখন সে কাজ করে লাবাং জাতির উন্নয়ণ প্রকল্পে । বর্তমানে সে সমুদ্রের ধারে কাজ করে । তার কাজ হল- কোনো পর্যটক অথবা নাগরিক, সমুদ্র স্নান করতে গিয়ে ডুবে গেলে তাকে বাঁচানো । যদিও লাইফ জ্যাকেট পরা নিয়ম তবুও অনেকেই পরেনা । আবার অনেকে সাঁতার দিতে গিয়েও ডোবে । কেউ সাঁতার না জেনে জলে নামে । ঢেউয়ের চোটে ডুবতে বসে । তখন সি-প্লেনে করে অথবা বোট নিয়ে তাকে বাঁচায় ,

যোশিমিটি ও অন্য কর্মীরা। অনেক সময় সে এইসব নিয়ে শিক্ষাদান করে। সপ্তাহে ৪ দিন জলবিহারে গিয়ে, বিপদে পড়াদের- রক্ষাকর্তা হয়ে জীবন বাঁচানো আর অন্যান্য দিন ও জলে না নেমে -রক্ষা করা নিয়ে শিক্ষা দেওয়া এইসব কাজ করে।

সুনেত্রাকে সে খুবই ভালোবাসে। ফোম্মো দেশের মেয়ে হলেও সে খুবই নম্র, ভদ্র আর রূপসী।

রং-টা একটু চাপা, নাকটা একটু বোঁচা , চোখ দুটি টানা টানা ও সরু তবুও সব মিলিয়ে চমৎকার দেখতে।সুনেত্রাও যোশ্‌কে ভারি পছন্দ করে।

ফোম্মো দেশ; লাল কাঁক্‌ড়ার দেশ। ওরা সেখানে সবসময় বিরাজমান। পথে-ঘাটে চলাচল করে ওরা। আমাদের যেমন পিঁপড়ে চলে সেরকম। একটা সময় সমস্ত পথ ছেয়ে যায় লাল কাঁকড়ায়।

দলে দলে ওরা শহরময় ছড়িয়ে পড়ে।

উৎসবের মতন সেই কয়দিন ওদের দেশে সব বন্ধ থাকে। প্রায় সাতদিন এরকম হয়। আসলে দিন পাঁচেক হয়। তার আগে ও পরে একদিন করে সরকার পক্ষ মোট সাত দিন ছুটি ঘোষণা করে।

ঐ সময়কে ওরা বলে লা-কিকিরা। একধরণের উৎসব ওদের। ঘরে বসে বসে উপাদেয় খানা বানানো, গল্প গাঁথা করা, শিস্ দিয়ে গান এইসব করে লোকে দিন যাপন করে ঐ কদিন। শুনলে অবাক হতে হয় যে ওরা কাঁকড়া আর শেঁয়াল পুজো করে। এরাই ওদের দ্বীপে মানে দেশে বেশি। সংখ্যায়। হয়ত তাই।

ওদের জন্মের সময় থেকে নাকি একজন করে শেঁয়াল দেবতা ওদের দায়িত্ব নেয়। পুরো জীবনটা সে-ই গাইড করে। বেশি কুকর্ম করে ফেললে তৎক্ষণাৎ শেঁয়ালের কোপে পড়ে মানুষটির মৃত্যু হয়। লা-কিকিরার মতন শেঁয়াল পুজোকে ওরা বলে - মোঙ্গিয়া।

উৎসব বলতে ওখানে এই দুটিই। হয়ত প্রকৃতির সাথে সখ্যতা করে বেঁচে থাকা- থেকেই এই সমস্ত উৎসবের আয়োজন, প্রয়োজন অনুসারে।

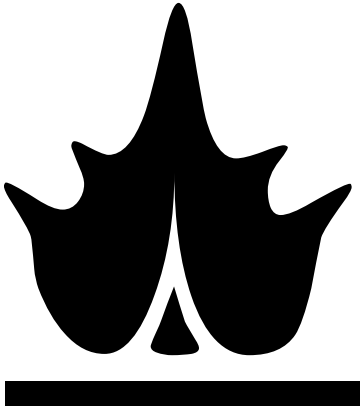

ফোম্মো দেশের মানুষদের বলে ফিউঁম্ । এরা লম্ফ দিতে ওস্তাদ । এক একটা লাফ দিয়ে, প্রায় সাত- আট -নয় ফিট্ অবধি উঠে যায় ওপরে । তারপর তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর ওপরে । এই খেলা আবার কলা হিসেবেও প্রদর্শিত হয় । লোকে বাহবা দেয় এগুলি দেখে । প্রথম প্রথম ওরা এইভাবে লাবাং জাতিকেও আক্রমণ করে । কিন্তু ওরা উন্নত বলে বিশেষ সুবিধে হয়না । তবে লাবাং জাতির বুদ্ধি আছে । এখন ওরা ফিউঁম্দের এই খেলাকে প্রচারের আলোয় এনেছে । ল্যাম্ডা দেশেও এই খেলা দেখতে ভীড় হয় । আরেক জাতের খেলা হয় ল্যাম্ডাতে । কাঠ কাটার খেলা । কে কতগুলো কাঠ; কত তাড়াতাড়ি কাটতে পারে তার খেলা ।

কাঠুরেরা সাধারণত: এই খেলায় নামে । প্রতিযোগিতা হয় বড়সড় । সেখানে তরবারি নিয়ে লম্ফও থাকে । ইদানিং শক্তিমান ও শুভবুদ্ধির মানুষ, যোশিমিটিও লম্ফ দিয়ে

তরবারি নিয়ে খেলায় নামছে । ফোম্মো থেকে শিখে এসেছে ।

আবার এখানে, নিজ দেশে -কাঠবুড়োর সাথে আলাপ । যার গল্প আগেই জানতো সুনেত্রা । যা সে নিছক এক গল্প বলে মায়ের কাছে বলেছিলো, সেই সিনার ফাঁদা গল্পই সত্য হয়ে দেখা দেয় কাঠবুড়োর ক্ষেত্রে ।

এক দেশে ছিলো এক বুড়ো । সে কেবল কাঠ কাটতো । কাঠ কাটার এমনই তার শখ যে পেশাদার খেলায় যোগ দিতে শুরু করে । সম্মানে কাঠ কেটে যায় বুড়ো , নিত্যদিন । ঘন বন-বনান্ত সমৃদ্ধ অঞ্চলের মানুষই প্রধানত এই খেলা খেলে । কে কত কাঠ চিরতে বা কাটতে পারে অল্প সময়ে, তারই নমুনা দেখানো হয় । জেতার পরে নানান সুবিধে ও মোটা অর্থ পায় লোকে । কাঠুরে থেকে হয় খেলোয়াড় । অনেক সম্মান পায় ।

আমাদের দেখা কাঠবুড়োর নাম কিয়ান । ল্যাম্ডা দেশের নাগরিক, এক লাবাং জাতির মানুষ সে । জন্ম থেকেই কাঠ তার ঘরবাড়ি । বাসায় বোঝাই করা থাকতো, কাঠের গুঁড়ি আর গাছের কান্ড । বড় বড় লরি করে চালান হতো বা লোকে কেটে কেটে বিক্রি করতো । সারা বাড়িতে বুনো গন্ধ । কাঠের মিহি গন্ধ ।

ভেজা কাঠের চাঁইও থাকতো। কিয়ান জানতো যে বড় হয়ে তাকে কাঠের দিকেই যেতে হবে। তাই কাঠুরে থেকে, হয়ে যায় কাঠ কাটার খেলা উড্ চপিং বিশারদ্। অনেক মেডেল পায়। অর্থও আসে দুই হাত ভরে। এটা ল্যাম্ডা দেশের জাতীয় স্পোর্টস্ তো, তাই।

সুনেত্রা ওদের দেশে পাহাড়ি এলাকায় থাকতো। সমুদ্রের পাড় থেকে উঠে গেছে ইয়া উঁচু উঁচু পাহাড় সব। সবুজ, সতেজ সব পাহাড়। সেই পাহাড়ের বুক থেকে ঝরে পড়ছে অজস্র ঝর্ণা , সোজা সাগরের মধ্যে। এরকম এক ঝর্ণার পাড়ে বাস করতো সুনেত্রা ও তার মা জয়সুধা। অনেকটা পথ বেয়ে ওরা ঝর্ণায় নেমে যেতো। সেখান থেকে খাবার জল ও স্নান ইত্যাদির জল সংগ্রহ করতো। কেউ কেউ ঝর্ণার বুকে বড় বড় গর্ত কাটতো। স্রোতের কারণে অনেকটা জল ঐ গর্তে জমা হতো। ঐ গর্ত পুকুরে

পরিণত হতো। সেখান থেকে অন্য কেউ জল নিতো না। একটা বেসিক্ অনেস্টি ছিলো এই ব্যাপারে। অবশ্য অনেকে -অন্যদের জল নিতে দিতো। কেউ বিক্রিও করতো। বিশেষ করে গরমে। গ্রীষ্মকালে। তখন ঝোরার জল কমে যেতো, তাই। পাহাড়ে, ভূগর্ভ থেকে প্রবাহিত জল কমে যাওয়াতে- অনেকে জল কিনতে বাধ্য হতো।

খালি পায়ে চরাই-উৎরাই বেয়ে, জংলী এইসব ঝর্ণায় গিয়ে জল সংগ্রহ করা সুনেত্রা ও তার মা; শিস্ দিয়ে পরস্পরের সাথে কথা বলতো এই সময়।

এখন তারা ইমেলে কথা বলে।

ফোমো দেশ থেকে ল্যাম্ডায় গিয়ে, শিখে নিয়েছে সব সুনেত্রা। কিন্তু জয়সুধা ইমেল করতে শিখেছে ওর মোবাইলে। ইদানিং ওরাও এসব ব্যবহার করছে।

ফোমো সমাজে বেকার লোক নেই। কারণ ওরা খুব কাজের। কর্মঠ আর পরিশ্রমী। সবাই কিছু না কিছু কাজ করে চলে। কেউ কোনো কাজে আপত্তি জানায় না। সবাই- সব কাজকে সম্মান দেয়। ওরা একধরণের কর্ম পূজায় অভ্যস্থ।

এই কারণে ওদের দিয়ে স্লেভের কাজ করায় অন্যরা । কিন্তু নিজেদের দেশেও, অনেক আগে থেকে ওরা এইভাবে কর্ম পুজো করছে । যেকোনো কাজ ওরা করতে শুরু করে । ঘুমায় কম । আয়েস করেনা প্রায় । অবসর নিয়েও নিজেকে কাজে ব্যস্ত রাখে ফলে দেহ সুস্থ থাকে । তাই জয়সুধা; বয়সের কোপে পড়লেও কাজ থেকে অবসর নেয়না । বর্তমানে সে পড়শীদের বাড়ির ছোটদের নানান রীতিনীতি শেখায় আর মেয়ের সাথে ইমেল করে করে নিজের অক্ষর জ্ঞান বাড়ায় ।

সেই ইমেলে ভুল থাকে । বাক্য গঠণে আর বানানে । কিন্তু হৃদয় স্পর্শ করে এই মাটির মানুষের সবুজ ফসল বুনুন । তাই ভালোলাগে পড়তে ।

সত্য দর্শনের কথা , বোধের কথা মনকে নাড়া দেয় ।

তরবারির ফলার মতন ফালা ফালা করে দেয় যত্তসব জমানো মোটাদাগের ধারণা । তাই সেই ইমেল পড়তে ইচ্ছে হয় ।

কাঠবুড়ো, কিয়ানের গল্পটা যা সিনা তার মা, সুধাকে বলেছিলো তা হল এই যে কিয়ান কাঠ কাটতো আর ওর বৌ , ঈশা করতো ফরেস্টে কাজ।

বন আর বনবাসী দিয়ে অনেকখানি ঢাকা , ল্যামডা দেশ।

তাই উড্ চপিং খেলা আর ফরেস্ট নিয়ে নানান কাজকম্মো চলতো। বন সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করতো ঈশা। দিবারাত্রি সে লোককে গাছ কাটতে বারণ করে। অথচ তার স্বামী রোজ নিয়ম করে কাঠ কাটে। সমস্ত কাঠ কেটে টুকরো টুকরো করে আর শুধু তাই নয় এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। অনেক অর্থও কামায় এর থেকে। কিয়ানের নাম ও যশ দুই হয়েছে, কাঠ কেটে কেটে। অথচ ওর লক্ষ্মী বৌরাণী , ঈশা -সবাইকে কাঠ সংরক্ষণ করতে বলে। এই ব্যাপারটা হজম হতোনা ঈশার। সবাইকে সে নিষেধের বুলি শোনাচ্ছে অথচ তারই অতি কাছের একজন এই কাঠ কাটা থেকেই পয়সা কামাচ্ছে ! নিজের সাথে যুদ্ধ ; পেরে উঠতো না ঈশা।

কিয়ান বলতো যে এটা তার পেশা ও নেশা। ঈশার কাজের সাথে না মিললে সে কী করবে ? কি-ইবা করতে পারে সে ? সব জেনেই তো ওরা একসাথে আছে। কোনো

লুকোচুরি নেই। তবুও ঈশার, এই নিয়ে মাথা ব্যাথা বাড়ে। লোককে না বলতে গেলে গলা কাঁপে। নিজের বাসার ঐ লোকটির মুখটা ভেসে আসে। বিবেকের কাছে সে ছোট হয়ে থাকে।

সুধা এই গল্প শুনে জানতে চেয়েছিলো যে আইডিয়াটা সিনা কোথা থেকে পেলো। সিনা হেসে বলে যে কাঠ কাটার খেলা হয় শুনে সে এই গল্প ফেঁদেছে। তখন কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানতো না যে সত্যি সত্যি এরকম এক মানুষ ও তার পরিবার এই দুনিয়াতে আছে আর তার সীমানার মধ্যেই।

++++++++++++++

ঈশা এমনিতে খুব পরোপকারি। ওদের সন্তান নেই। তবুও লোকের উপকার করে যায়। মনটা ভালো তার।

অবসরে গা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে থাকেনা। হয়ত তাই বিবেকের দংশন হয়। লোকের সাথে যেচে আলাপ করা, গাছের চারা উপহার হিসেবে দেওয়া- নেটিভ প্ল্যান্ট ইত্যাদি আর সময় সুযোগ হলে মানুষকে সুস্বাদু খাবার রান্না করে করে খাওয়ানো, ঈশার স্বভাব।সে নিজের স্বার্থের জন্য কিছু করেনা। বরকেও খুব ভালোবাসে যদিও মনটা সবসময় খুঁত খুঁত করে।

শেষকালে পরাজিত হয় নিজের কাছে। স্থির করে যে নিজের লক্ষ্য থেকে সরে যাবেনা। সামাজিক দায়িত্ব নিয়েছে যখন- তখন তা সুষ্ঠুভাবেই সে পালন করবে।

তাই একদিন কিয়ানের মুখোমুখি হয়। বলে যে কিয়ান কী চায় ? স্ত্রীর সম্মান নাকি নিজের নেশা। কিয়ানও দমবার পাত্র নয়। এটা যদি ঈশার পেশা হয় তাহলে ওটা কিয়ানেরও নেশা। অনেক পেয়েছে কাঠ থেকে। তাকেই বা উপেক্ষা করবে কী করে ? করা যায় ?

ফলে দুজনের মাঝে একটা কাঁচের দেওয়াল এসে উপস্থিত হয়।

কিয়ান আর ঈশা তবুও এক ছাদের নিচে থাকে। অনেকদিন। তারপর ওদের ডাইভোর্স হয়ে যায়। তবুও ওরা পাশাপাশি, বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে। একটা সময় কিয়ান- দুটো বাড়ি কিনে নেয়। একটা ঈশাকে দান করে। মানে উপহার হিসেবে দেয়। ঈশা এখন ওর বান্ধবী। প্রিয় বান্ধবী। স্ত্রী নয়। কোনো আইনের বাঁধন নেই। তবুও সম্পর্কের এক সুতোতে বাঁধা। বন্ধু , বান্ধবী। আর এই বন্ধন অসম্ভব নিবিড়।

কারণ ঈশাকে ছাড়া কিয়ানের চলে না । আর ঈশাও কিয়ানকে ছেড়ে বেশিদিন থাকতে পারেনা । একসাথে থাকলে ঝগড়া হয় । কিন্তু দূরে চলে গেলেই বুকে এক তীব্র যন্ত্রণা হয় । মনে হয় হার্ট ফেল করবে ।

তাই ওরা স্বামী -স্ত্রী নাহলেও, পাশে পাশেই থাকে । জীবন পাশার চাল, যতই কটূ মনে হোক্ না কেন !

সুনেত্রার গল্পের নায়ক আর নায়িকার নাম কিন্তু ভিন্ন । কিয়ান আর ঈশা নয় । তারা হল ধুম্রল আর সাহিলা ।তাতে কী ? কাহিনীর প্রতিটা লাইন এক । নিদারুণ এক গল্প । সিনার বুক থেকে প্রবাহিত হয়েছে লাবাঃ জাতির দিকে । ওখানে সে তার গল্পের নায়ককে রক্তমাংসের আকারে দেখেছে ।

আর তা সত্যি; ওর মা তার সাক্ষী ।

সুনেত্রার বোন সাঁচী বলে যে :: দি, তুই হয়ত স্বপ্নে এটা দেখেছিলি অথবা ল্যাম্ডা দেশের কারো কাছে কখনো শুনেছিলি !

সিনা রীতিমতন রেগে যায় !

---নাহ্ নাহ্ নাহ্, আমি এটা কল্পনা করেছিলাম।

আর সত্যিই তাই। ওদের মা জয়সুধা তা জানে।

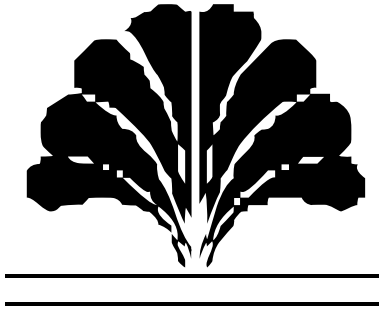

যোশিমিটি, তো সমুদ্রে পাহারা দেয় । সবসময় নৌকো নিয়ে তৈরি থাকে । একদিন ওকে সিনা বলে ওঠে :: জানো আমি তো ঝোরায় জল নিতে যেতাম । তখন সমুদ্র দেখতাম । কারণ তার গর্জন শোনা যেতো ঐ ঝর্ণার বুক থেকেও । যেন ঝোরাকে ডাকছে সে ।

------আয় আয় আমার বুকে !

কিন্তু বিশ্বাস করো আমি খুব ভয় পেতাম সমুদ্রকে । এতো বড় বড় ঢেউ তার । কী গর্জন -বাপ্‌রে !

ভাবতাম যারা জাহাজে করে যায় , তারা খুব সাহসী । অথচ আজ দেখো তুমি আমার স্বামী । তোমার কাজ সমুদ্রের বুক থেকে ডুবে যাওয়া মানুষ তোলা ! কখনো তুমি ডুবুরী কখনো বা ভাসমান একটা নিরাপদ হাত ।

আমার জীবনে সমুদ্র ভয় ছিলো । কিন্তু তুমি সেই সাগরে থাকো । ভাসো । ভালোবাসো । অথচ কাঠবুড়ি তার

স্বামীকে ছেড়ে দিলো । কৈ, সমুদ্র তো আমাদের আলাদা করেনি ? তাহলে কাঠ কেন ওদের ভাঙলো ?

যোশিমিটি হেসে ওঠে । তারপর বলে :: আমি তা কী করে জানবো বলো । হয়ত ওদের বন্ধন তেমন শক্তপোক্ত ছিলো না । বাইরে কাঠ অথচ ভেতরে মাখন । তাই মাখনের মধ্যে দিয়ে ছুরি চালিয়ে দুজনে আলাদা হয়ে গেছে ! তা তোমার গল্পেও কি এমনটা ছিলো ।

রেগে ওঠে সিনা ::: হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ ! কতবার তো বলেছি যে সব এক । পুরো লাইন বাই লাইন এক । তবুও তুমি , সাঁচী এত সন্দেহ করো কেন ?

---কারণ আমরা জিনিসটা হজম করতে পারিনা ।

---কেন ?

---কারণ এরকম শুনিনি কখনো ।

--- **Déjà vu** , তো হয় জানো না ?

---জানবো না কেন কিন্তু স্বচক্ষে দেখিনি এমন কাউকে । তবে হ্যাঁ, সে তো তোমার আমার মাঝেই থাকবে । ইটি তো নয় কী বলো ? আবার হাসে যোশিমিটি ।

মানুষের ভালো করতে আগ্রহী , ক্রিপটো কারেন্সি থেকে সাধারণ মানুষের সুবিধে করতে ইচ্ছুক এই যুবক একটু বেশি হাসে। সবসময় হা হা হা --- !!!

নিন্দুকে বলে- দাঁত ক্যালানে বাঙ্গারাম।

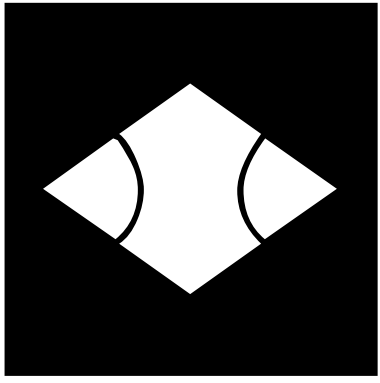

আমরা যদি গল্প থেকে বাস্তবে ফিরি তাহলে দেখা যায় যে কিয়ান বেশ কিছু বছর পরে তার কাঠ নেশা থেকে ছুটি নেয় । আসলে প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে বদলে দেয় । যেমন একটি রোবট এসে- শেফের হাতের নড়াচড়া অনুকরণ করে ,সুস্বাদু ডিশ রান্না করে দিচ্ছে অথবা এক রোবট নার্স এসে রুগীকে খাইয়ে দিচ্ছে । কিন্তু আদতে প্রোগ্রাম করা বলে, রুগী খেতে না চাইলেও জোর করে তার মুখে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আবার এক ব্যাক্তি আইনের হাতে ধরা পড়েছে । বন্দী বলা যায় । তার অপরাধ হল সে একটি রোবট বানিয়ে তার সাহায্যে মানুষ খুন করছিলো । নিজের আবিষ্কারের মাধুর্য্যে মোহিত, এই লোকটি আসলে গ্রামে ভূতের গল্প প্রচার করে । লোকে, ভূতের হাত আছে এই খুনে- ভাবলেও পরে ধরা পড়ে যে ভয়াল লোকটি আদতে একটি রোবট । অত্যাধুনিক রোবট । প্রযুক্তি যে যেভাবে ব্যবহার করে, সেইভাবে তার কার্য সিদ্ধি ঘটে । ভালো করলে ভালো, মন্দ করলে মন্দ ।

এইক্ষেত্রে কিন্তু কিয়ান ;টেকনোলজিকে ভালোর জন্যই ব্যবহার করলো। মোবাইলে সে ভিডিও গেম খেলতে শুরু করে । সেই গেম-গুলি অসাধারণ । বিশেষ করে উড্ চপিং গেমটা । থ্রি –জিয়ের যুগে অসম্ভব কিছু নেই । তাই এক শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে সে কাঠ কাটতে শুরু করে। আদ্যপান্ত কাঠুরে হিসেবে। কিন্তু দুনিয়ার একটিও গাছ কাটা পড়েনা।

এই গাছ কাটা নিয়ে এক ব্যাক্তি -এলাকার এক পাদ্রীকে খুন করে। পাদ্রী, গাছ পুঁতে অরণ্যের সমৃদ্ধি ঘটাতেন। আর ঐ লোকটি ছিলো চোরাচালান কারি । কিন্তু পরে লোকটি কন্‌ফেস্ করলে, ফাদারের ফিউনেরালের রাতে সে স্বপ্ন দেখে যে পাদ্রীসাহেব , ফাদার অ্যান্তোনিও তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কাজেই সে যেন এই জীবনে কোনো রকম কষ্ট বা অপরাধ বোধ নিয়ে না বাঁচে। সুস্থ , সবল, সম্পূর্ণ জীবন যাপনে ব্রতী হয়। আর সত্যি একে স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবেনা । কারণ ফিউনেরাল এর সার্ভিস হবার সময় একটা ফুলের স্তবক উড়ে গিয়ে সেই লোকটির গায়ে পড়ে। ব্যাপারটা কাকতলীয় বলে যুক্তিবাদীরা মনে করলেও খুনী মানুষটি বুঝতে পারে যে সত্যি সত্যি ফাদার অ্যান্তোনিও তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

কাঠ কাটা থেকে পুরোপুরি অবসর নিয়েছে কিয়ান। এখন ভিডিওতে উঁড় চপিং চলে। সারাটা দিন।

আর পাশাপাশি বাসায় থাকা ঈশা- খবরটা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে। তাই সামনের বসন্তে ওরা নাকি আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

একটা গাছ, অর্দ্ধেক কাটা অবস্থায়- ওদের পুরনো বাড়ির বাগানে পড়ে ছিলো। কারণ ঈশার তৎপরতায় ঐ গাছ কাটা থেকে বিরত থাকে কিয়ান।

কিছুতেই তা কাটতে দেয়না ঈশা।

প্রায় পাঁচ ফিট উচ্চতার এই বৃক্ষ দেখে লোকে অবাক হতো। একটা কাঠের লম্বা, দৃষ্টিকটূ অবয়ব !!

কিয়ান অনেক বার বলেছে যে দেখতে খারাপ লাগছে ওটা কেটে দেওয়া হোক্। কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল ঈশা কিছুতেই তা হতে দেবেনা। কিছুতেই না। আর কোনো কাঠ কাটা চলবে না- ওর গৃহের প্রাঙ্গনে।

কাজেই দুজনের মনোমালিন্য বাড়ে । বাগানে একটা বেয়াড়া কাঠের আকৃতি । লোকে হাসাহাসি করছে ওটা দেখে । তবুও ঈশা ওটা কাটতে দিলো না ।

পরে অবশ্য সে নিজেই একটা মতলব আঁটে ।

লম্বা, ঐ কেঠো অবয়বে একটি সান্টা ক্লজের পোশাক পরিয়ে দেয় । তাতে মনে হয় যেন বুড়ো সান্টা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ।

তাতেই লোকে হাসাহাসি বন্ধ করে । তির্যক মন্তব্য করা বন্ধ করে । বরং ঐ পোশাকে বুড়োকে ওখানে দেখে কচিকাঁচার দল নিয়ম করে আসতে শুরু করে, কিয়ানের বাসায় ।

বিশেষ করে যীশু দিবসে ওখানে বিরাট লাইন পড়ে যায় । বুদ্ধি করে এই পোশাক পরানো ঈশা, মিটিমিটি হাসে ঐ লাইন দেখে । ইদানিং টিকিটের চল হয়েছে । ফ্রিতে কিছু হয়না ।

দুজনের নতুন করে বিয়ে হয়। বিয়েতে অনেক লোক জমায়েৎ হয়। তবুও কাঠবুড়ো তার ভিডিও গেম বন্ধ করেনা।

লোকে বলে :: ওহে কিয়ান , অন্তত: আজকের দিনটা বাদ দাও !

কিয়ান বলে :: আরে বৌ তো পুরনো। আর আমার কি আর সেই বয়স আছে ? তাই মোবাইলে খেলছি।

খানাপিনা হয় দারুণ ! ওল্ড ওয়াইন ইন নিউ বটল দেখতে অনেক লোক আসে। বন্ধু বান্ধব , পাড়া-পড়শী এমনকি অচেনা অনেকেও । দ্বিতীয়বার বিয়ে প্রথম বারের বৌকে। ঝামেলা কাঠ কাটা নিয়ে। কাঠ এখনো কেটে চলেছে তবে মায়া জগতে বসে। মায়াজাল থেকে না বেরিয়েও বাস্তবে থাকা সম্ভব আজকের দুনিয়ায়। তারই উদাহরণ এই বিয়ে।

নকল দাঁত ব্রাশ করার জন্য, যেই টুথ ব্রাশখানি ওকে উপহার দিয়েছে ওর রি-ম্যারি করা বৌ ঈশা , সেটা

মুখে চেপে ধরেই, বোতাম টিপে সমানে কাঠ কেটে চলেছে কিয়ান।

খট্ খট্, খট্ খট্ ----- খট্ খট্, খট্ খট্ -----

খট্ খট্, খট্ খট্ ----- খট্ খট্, খট্ খট্ -----

জাদুকরের এই কাঠ- শব্দ; যোজন ক্রোশ দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে। খট্ খট্, খট্ খট্ -----

খট্ খট্, খট্ খট্ -----খট্ খট্, খট্ খট্ ---

কাহিনীর শেষটাও এক। কী করে সম্ভব হলো ?

তখন তো মোবাইলে, এইসব এলোপাথারি গেমের চল ছিলো না ? তাহলে ?

খট্ খট্, খট্ খট্ ----- খট্ খট্, খট্ খট্ -----

খট্ খট্, খট্ খট্ ----- খট্ খট্, খট্ খট্ -----

একে যাই বলোনা কেন এক ধরণের জাদু তো বটেই ! মায়া , কায়া নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাই না ?

যে যাই বলুক না কেন, জয়সুধা জানে যে সুনেত্রা মিথ্যা বলছে না। কারণ সেই একমাত্র সাক্ষী , এই গল্পের যা শুনেছিলো অনেক আগে।

অনেক কাল আগে , নিজ কন্যার মুখে শোনা এই গল্প আজ জীবন্ত ঘটনা। কিয়ান জীবন্ত , ঈশা জীবন্ত। মোবাইল গেম বাস্তব , থ্রি-জি।

কেবল একটা জিনিস আলাদা। নামগুলো।

চরিত্র এক। মুখ এক। মুখোশ আলাদা। তাতে কী ?

মুখোশ তো খুলে ফেলা যায় !

ধূমল হল কিয়ান আর সাহিলা ; ঈশা !!!

এত আশ্চর্য হবার কী আছে ? ঘটনা , তার পুনরাবৃত্তি। আবার অন্য কোথাও একই ঘটনা, অন্য কোনো মুখোশের আড়ালে ঘটছে। প্যারালাল কোনো সভ্যতায় ,আবার একই গল্প।

শেষ পর্যন্ত সব এক। আজগুবি মনে হলেও এ সত্য। আর সাক্ষী একমাত্র জয়সুধা। প্রতিটি লাইনের। বিন্দু বিসর্গ এবং কমা , কোলনের।

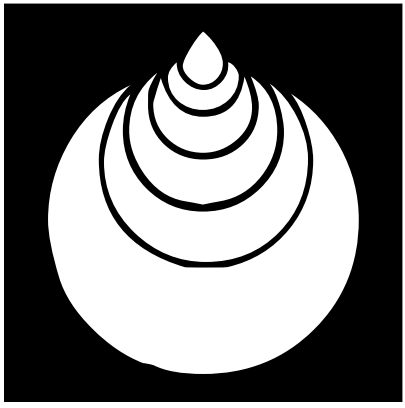

"Friendship happens when the distance between the hearts tends to zero."

— **Amit Ray**, **World Peace: The Voice of a Mountain Bird**

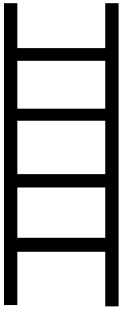

অন্য গদ্য

প্রফেসর রমেশ সান্যাল ও বিজ্ঞানী মধুরা শ্রীবাস্তব ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিবাহের সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু প্রফেসর সান্যালের সাত্ত্বিক মা এই অসবর্ণ বিবাহে মত দিতে রাজি হননা। প্রফেসর ও মধুরা অপেক্ষা করেন দীর্ঘকাল। মাতার মৃত্যুর পর -বৃদ্ধবয়সে, ওরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার প্রস্তুতি নেন। তাঁদের এই অমর প্রেমগাঁথা নিয়েই এই গদ্য কবিতা। যদিও নাম পাল্টে দেওয়া হয়েছে।

প্রফেসর সান্যাল একজন প্রথম সারির ক্রিস্টালোগ্রাফার ছিলেন। ক্রিস্টালোগ্রাফির বহু বিভাগে, ওঁকে পায়োনিয়ার বলা হয়।

অমল সবুজ লগন

পলাশ প্লাবিত পথ ধরে

মৃগাক্ষী হেঁটে যায় , এলোকেশে কাঠগোলাপ

মৃদুমন্দ পায়ে ।

কপালে বলিরেখা মুখে নেই লাবণি

শ্রাবণ সন্ধ্যার মতন সজল চাহুনি ।

এক হাতে স্টিফেন হকিং অন্যহাতে

মুগ্ধতা , ডাহুক দুপুরে পদ্মপুকুরে

জটিল নীরবতা ।

লোলচর্ম প্রফেসর

বিদ্যার ভারে ন্যুব্জ হননি

নয়নে প্রণয় কাতরতা ,

হৃদয়ে ছন্দময় তরুণ তিনি ।

উনি মধুরা শ্রীবাস্তব

ইনি প্রফেসর , রমেশ সান্যাল

কপোত কপোতীর মতন

জুটি বাঁধা হলনা যাঁর ।

সাত্ত্বিক বিধবা মাতা বৃন্দাবন ধামে আসীন

অবাঙালী অজাত কন্যার পানিগ্রহণ

মুস্কিল ।

একসঙ্গে ল্যাবে কাটে দিন, চাঁদ দুমরে মুচরে যায়

জোছনায় পা ডুবিয়ে

হাঁটা মসৃণ ঘাসের কণায়।

সূর্যসাক্ষী হয়ে থাকে

অকথিত ভালোবাসার

বিমূর্ত প্রেমের ধ্বনি ...

বাজায় মধুর ঝঙ্কার।

কাটে দিন , মাস , বছর

ঘোরে ধরিত্রী আপন চাকায়

অবিশ্রান্ত মধুক্ষরণ

মনের মণিকোঠায় ।

বৃন্দাবনে ধুসর মেঘ ,তুলসী কাঠ ছিন্ন হয়

নগরপাড়ে রূপনগর , আকুল শোকসভায় ।

সময় বয়ে যায়

আপন দিশায় ,

স্বচ্ছ স্ফটিক রঙীন হল

পূর্ণতার সুকোমল বিভায় ।

মাঙ্গালিক কাজ , তিথি নক্ষত্র

মিলে যায় দিন ক্ষণ

চল্লিশ বসন্তের প্রেম আলেখ্য

হবে কাল অবসান।

সাগ্নিক সপ্তপদী , হোম যজ্ঞের

আয়োজন , এই বয়সে লাল রঙ ?

কনের জন্য বেমানান।

পরদিন প্রত্যুষে উলুধ্বনি শোনা যায়

কনে কৈ কনে কৈ ?

প্রফেসর নত লজ্জায়।

এখন মধুমাস , দিগন্ত লাল শিমুল সজ্জায়

কিংশুক , অশোক ,হাত ধরাধরি

করে দাঁড়িয়ে

ল্যাবের আঙিনায় ।

তারই মাঝে হঠাৎ যেন

একটু করো মেঘের

আনাগোনা , শুদ্ধ প্রেম কি তবে পরিণতি

পাবেনা ?

কনে হারিয়ে গেছে , কোলাহল ভেসে আসে

চাপা ক্রন্দনের সুর আকাশে বাতাসে

বাগিচার ঈশান কোণে

প্রফেসর উদাস মনে

চেয়ে থাকেন করুণ চোখে

বুক ভাসে জলোচ্ছ্বাসে।

ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক এক জ্বালা

চিকিৎসার সময় দিলেন কৈ

ডাক্তার হতাশ স্বরে বোনে কথামালা

নি:স্তব্ধতা খনন করেন অধ্যাপক একাই।

বৃক্ষতলে শায়িতা মধুরা , শ্বেত বস্ত্রে নির্মল ,

নানান পুষ্প ছড়ানো শেষ শয্যায়

রমেশ অস্তিত্ব অসাড় হল

আঁখিপল্লব জোড়া, কাতরতায় ,

চন্দনের গন্ধে চরাচর মাখানো

মুখমন্ডলে অপার শান্তির ছোঁয়া

শুধু বিবর্ণ সিঁথিতে লালিমা ছড়ানো

ঝরে পড়া এক পলাশ পাপড়ি ধোঁয়া ।।

ফাগুন বেলায় পদাবলী

কংক্রীট শামুকের খোলস ছেড়ে

এলাম প্রকৃতিতে।

নয়নাভিরাম শ্যামলিমার নিবিড় সান্নিধ্য উপলব্ধ হল।

লালমাটির পথ গেছে বেঁকে সুদুর কোন গ্রমীণ বিতানে। বাঁশিওয়ালার বাঁশি শুনে জুড়ায় প্রাণ। বিষাদ নুড়িগুলোর রাধাচূড়া রূপটান।

শাল পিয়ালের বন পেরিয়ে ঘন ইউক্যালিপ্টাসের আতরমাখা পথ

উদাসী হয় ক্যাকটাস মন।

এক না মানুষের পাখি হয়ে ওঠার পদাবলী

হংসপাখায় , বাঁধনহারা সংলাপে লিখে চলে।

ছোট্ট একটা গুমটি। চায়ের সরঞ্জাম।

আকাশ নীল মেখলা পরেছে আজ। শীতল সমীরণ অবিরাম।

সোনালী বেণী দুলিয়ে গরম চায়ের ভাঁড় হাতে মন্দাক্রান্তা।

মন্দাক্রান্তা বক্সী। সুচারু মসৃণ উচ্ছল।

প্রিয়দর্শী ? তুই এখানে ?

একসঙ্গে ছবি আঁকা শিখেছিলাম।

বললো-শান্তিনিকেতনে আছি , ভাস্কর শর্বরী রায়চৌধুরীর কাছে মাটির ভাঙাগড়া শিখছি !

নিজেও টেরাকোটা হয়েছে , রূপসী শায়েরী যেন।

কাজলকালো দীঘল আঁখি মেলে মন্দা অভিমানী –

এতদিনে আমাকে মনে পড়লো ? পড়লেই যখন –

চল দোঁহে ঘুরে আসি।

নিকানো উঠান , দেওয়াল জোড়া আলপনা ,

পোড়ামাটির খাঁজে

শাপলা শালুক খোঁপায় দেওয়া

আদিম মানবীর আহবান

অবহেলা করে শুধু চলা চলা আর চলা।

পা গুলো জমাট বেঁধে গেছে !

অনেকটা পথ হাঁটলাম ,

টলটলে সরোবর দেখে

কিনারায় বসলাম।

ও জলের ওপর ধূসর পাথরে , আমি সোপানে।

বকম বকম বকম ---

কথা যে ফুরায় না !

মন্দাক্রান্তা ছন্দোবন্ধনে বাঁধা পড়লাম।

ও বললো– দেখ পাথরটা ফসিল হয়ে গেছে !

মনে হল পৃথিবীর প্রথম শিলাখন্ড।

এলো খোঁপায় পলাশ গুঁজে দিলাম।

হাল্কা সুগন্ধ হাওয়ায় ভেসে গেল

ঘ্রাণ নিল,

ও হাসছে , আমি গালিব আওড়ালাম

ও দুলছে , আমি জীবনানন্দ --

ওর ছায়া ঢলে পড়ছে

দীঘির কালো জলে

আমি পাড়ে বসেই তলিয়ে গেলাম।

হঠাৎ মৃদু স্বরে

কে যেন বলে যায় --- ধোপানী রামীকেও উনি এইভাবে ফুল দিতেন ,

ঐ পাথরে রামী কাপড় কাচার ছলে ,

কালিমা তুলে মুগ্ধতা ছড়িয়ে দিত।

চমকে উঠি!

কে তুমি? কি নাম?

নির্মল হাসি ওর ভাঙাচোরা, ক্ষয়াটে মুখে:

আমি এক পথভোলা পথিক

সুবাতাস নাম,

এটা নানুর গো!

চন্ডীদাসের গেরাম।

অভিনেতা

লোকে লোকারণ্য। মঞ্চসজ্জা, আলোর রোশনাই, চড়া সাউন্ড সিস্টেম।

বিন্দাস দর্শক। মেহুলকুমার। মেহুল কুমারের শো আছে আজ।

ছায়াছবির সুপারস্টার। কত মানুষের আশা ভরসা স্বপ্ন

মুঠোতে ভরা ওর।

চক্‌চকে জামা আর হীরের দ্যুতিতে মোহময় মেহুল।

পর্দা সরতেই ভেসে আসে চটুল হিন্দী গানের সুর।

অঙ্গ দুলিয়ে নাচ। হৈ হুল্লোড়। শো শেষ হতে হাততালির ঘটা।

হাততালির শব্দে ঢেকে যায় মোবাইলে গায়ত্রী মন্ত্রের রিং টোন।

বাড়ি থেকে ফোন। পুত্রের ফোন। পিতাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে সুদূর শহর থেকে। টিভিতে দেখেছে সে পুরোটাই।

ব্যাকস্টেজে নেমে যান অভিনেতা মেহুলকুমার। ছেঁকে ধরে সাংবাদিকেরা।

একজনকে বেছে নেনে মেহুল। ঢুকে যান নিজের মেক আপ ভ্যানে।

সাংবাদিক মহলে গুঞ্জন।

মেহুল কি প্লে বয় ?

মেক আপ ভ্যানে তখন তরুণী সাংবাদিক অমিতা পুরী খুলে বসেছে প্রশ্নপত্র।

অমিতাকে ভালোলাগে মেহুলের।

ওর স্ত্রী বেবী ওর দুই সন্তানের জননী।

আলাপ কৈশোরে। এক সঙ্গে কলেজের মিঠে রোদ পোহানো, ভেল পুরি খাওয়া।

মহাবালেশ্বরে এক্সকার্শনে গিয়ে পাহাড়ের নিচে ঝুঁকে দেখতে যাবে মেহুল –

তখন প্রমোদ সেইসময় ছোঁয়াছুঁয়ি। আসলে প্রমোদ ওকে সরতে বলেছিলো।

উত্তরে বেবীর সপ্রতিভ জবাব – আমাকে সরতে হবে ?

লাখপতি ,পুরনো গাড়ি কেনা বেচা করা মিস্টার চাড্ডার

মেয়ের সঙ্গে অচিরেই প্রেমের বন্ধনে বাঁধা পড়লো মেহুল।

তারপর নিয়মমাফিক সব। পুণেতে ফিল্ম ইন্সটিটিউটে পড়া শেষ হলে প্রজাপতি নির্বন্ধ।

কয়েকবছর ভালই কেটেছিল। তারপর শুরু হল মানসিক

অবসাদ , মেহুলের ।

সাংসারিক জীবনে আপাত দৃষ্টিতে সে সুখী হলেও কোথায় যেন একটা বিরাট ফাঁক থেকে যেতো ।

বেবী সিনেমা বোঝেনা , বেবী সত্যজিৎ রায় , Akira Kurosawa , Federico Fellini দেখেনা ।

বেবী নিজেকে ভাঙতে জানেনা ,গড়তেও জানেনা ।

বেবী পারেনা চরিত্র হতে ।

বেবী কি ভীষণ মানুষ , কি ভীষণ পার্থিব ।

ওর অন্য জগৎ নেই , সীমার মাঝে নিজেকে নিয়েই সুখী সে । অথচ এই বেবীকেই একদিন খুব ভালোলাগতো । কি নিরীহ , নির্মল , কি সুন্দর !!!

আজ সে আরো উজ্জ্বল , প্রাচুর্যে কিন্তু প্রমোদের ওকে বড্ড ম্যাড় ম্যাড়ে লাগে । কেন?

ওর সঙ্গে কথা বললে হাঁপিয়ে যায় প্রমোদ ।

সন্তানের পড়াশোনা, বেড়ানো , কেনাকাটা বড়জোর শাহরুখ খানের হিট সিনেমা , এর বাইরে বেবী কিছুই জানেনা । প্রমোদ ওরফে মেহুল ক্লান্ত ।

এক বৃষ্টি দিনে হঠাৎই দেখা অমিতার সঙ্গে।

চিরাচরিত সাংবাদিকদের মতন সে নয়। গসিপে তার উৎসাহ নেই। সে জানতে চায় অভিনেতাকে ,

সিনেমার অচর্চিত সুক্ষ্ম দিকগুলো। একটি পাইন পাতা দিয়ে বন্ধুত্ব পাতালো উটির

এক কাঠের রিসর্টে। হাল্কা পানীয় , মধুর বিলাপ।

হৃদয় স্পর্শী সংলাপ। বহুদিন যেন এই দুয়ার বন্ধ ছিল মেহুলের।

কথা তো বেবীর সঙ্গেও হয় কিন্তু সে তো তোতাবুলি , কথা নয়।

অমিতা মেহুল মন জুড়ে বসে, মেহুল হয় অমিতা নির্ভর।

অমিতার মিতালী ঝড় তোলে দাম্পত্য জীবনে। মেহুল ওদের বোঝাতে পারেনা যে

বালির বুকে হেঁটে হেঁটে সে ক্লান্ত। এবার সে গা ভাসাতে চায় নীল সাগরে।

অমিতার প্রশ্ন ভেসে আসে সুদূর নীহারিকা থেকে–

--এত হাততালির মধ্যে সুপারস্টার মেহুলের নিজেকে

হারিয়ে ফেলতে কেমন লাগে ?

মেহুল নীরব। কি যেন ভাবছে , একমনে।

অনেক ক্ষণ পরে জবাব আসে- সুপার স্টার আসলে অভিনেতার একটি মুখোশ ;

অভিনয়ের সময় যা খুলে পড়ে। সুপারস্টার মাটির তাল।

তাতে প্রাণ সঞ্চার করে ;অভিনেতা। তিনি আদতে শিল্পী। শিল্পী তাকেই বলে যিনি হাততালিতে কর্ণপাত করেন না। তারকা হয়েও মঞ্চসজ্জা , আলোর রোশনাই , দর্শকের হর্ষধ্বণি ছাড়িয়ে তিনি চলে যান আকাশের বুকে। তারায় তারায় , নক্ষত্রে নক্ষত্রে তার বিচরণ।

অশ্বিনী , ভরনী , কৃত্তিকা, রোহিনী , মৃগশিরায় উড়ে যান অভিনেতা ;

মুঠো মুঠো আনন্দ নিয়ে।

মগ্ন তখন স্রষ্টা এক স্বর্গীয় ও শৈল্পিক স্বমেহনে।

সে আনন্দ পৃথিবীর কোন মানুষ তাকে দিতে পারেনা।

পারে অপার্থিব এক আলো।

অভিনেতা আলোর পাখি।

সেই আলোর খোঁজেই আমি হারিয়েছি আমার ঘর , তুমিও

আলোর পথিক , তোমাতে হয়েছি নিবেদিত ।

আমরা দু জনেই আলোর পাখি , তোমার চোখে দেখেছি আলোর ঝিলিক । দু নিয়া তোমায় চরিত্র দোষ দেবে , আমার প্লে বয় বলবে ।

দু নিয়া আর কি বোঝে বলো ? ওরা শুধু চাওয়া পাওয়ার হিসেব বোঝে, অভিনেতা এনডোর্সমেন্ট থেকে কত টাকা কামালো তা ব্যালেন্স শীটে বসায় ।

অন্ধকারের জীব , আলোর হদিস জানেনা ।

জানতে চায়না ।

শিল্পীরা আজন্ম যাযাবর ।

অভিনেতাদের কোন ঘর হয়না , ঘর থাকেনা ।

অভিনেতারা আনন্দ পাখি , যারা সু নীল আকাশে শুধু ডানা মেলতে চায়

নাহলে প্রাণটা তাদের হাঁপিয়ে ওঠে আর একসময় পিঞ্জরে থেকে থেকে মৃত্যু হয়; দু নিয়া যার খবর রাখেনা ।

কলকাতা ২০২৫

এসেছে সোনারঙা নামের একটি মেয়ে ভিনদেশ থেকে।

মেয়েটি যেখানে যায় সময় থমকে যায়!

একবছর যেন কাটেই না। এসেছে কলকাতায়, ভয়ে ভয়ে, কি জানি কী হয়।

শুনেছে কলকাতায় সময় অলরেডি থমকে। লোকে বলে, এখানে মানুষ চলেছে পিপীলিকার মতন, মেটে সিন্দুর পরা বিহারী, ফুলের সাজি হাতে ওড়িয়া মানুষ স্থানীয় বাঙালী বলে : ওরা চলে উড়ে উড়ে ----

আর অজস্র পথভ্রষ্ট যুবক দল বেঁধে চলেছে।

মিছিল নগরী, জাদুহীন লৌহ কারাগার। নতুন বসন্ত আসেনি। শীতের পাতাঝরা গানই বয়ে চলেছে চারিদিকে।

ইডেন গার্ডেন কবরখানা। কবরখানায় সাবধান।

পা হড়কে পড়বেন কফিনের ভেতরে। লাল আবীরে ঢাকা ময়দান। আবীরে ফসল হয়না তাই বাংলা আজ খরা ভরা রাজ্য।

সোনারঙা এসেছে সোনার কলস নিয়ে। কলস ভরা জল, মধুঋতু, অরণ্যের ঘুঙুর গান, মেঘবৃষ্টির সন্ধিক্ষণ ---- ----এ এক আশ্চর্য কলকাতা ----

সোনারঙা চমকিত। কলকাতা বদলে গেছে। কর্মী মৌমাছির মতন মানুষ ছুটে চলেছে পথ বেয়ে। পথ নয় রাজপথ। সুন্দর, মসৃণ রাস্তা। দুইপাশে সবুজ গাছ ও সুচারু ফুটপাথ। মানুষজন ব্যস্ত, ত্রস্ত নয়। ঝালমুড়ি, আলুচাট যে যেখানে থাকুক নিয়ম করেই আছে। ফুচকায় লেগেছে আগুন। ফুচকা জ্বলছে। নব ফুচকা। দোকানের নাম ম্যাকডোনাল্ডস্। বিদেশী ভেলপুরি তৈরি ও বেগুনী ভাজা হচ্ছে।

নকশাল আন্দোলন হয়েছে মাওবাদ কিন্তু আজ তাও খতম করেছেন কলকাতার মানুষ। সমস্ত চাওয়াপাওয়া মিটে গেছে দরিদ্র মানুষের। কারো হাতে নেই বন্দুক। শুধু কলম কিংবা ফুল। পুলিশ বলেও কিছু নেই। এখানে নেই আইনের কড়াকড়ি কারণ কেউ আইন ভাঙেন না। মানুষ এর বিপদে আপদে ছেলেপুলেরা ---দাদা- দিদি বলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাসপাতাল যেন স্বর্গপুরী। স্বর্ণ পলাশে ঢাকা

শিয়ালদহ স্টেশান। হাওড়া স্টেশান। নিয়মিত রেল চলে, বাস চলে। অটো হয়েছে আরো আধুনিক। অটোওয়ালা বন্ধুবর। আগের মতন নয় হিংসাপ্রবণ।

কমিউনিস্ট পার্টির আমসি মুখো মিথ্যুক দাদা-দিদিরা গেছেন শীতঘুমে। ভদ্রলোক আজকাল ভদ্রভাবে পথেঘাটে চলতে সক্ষম। উজ্জ্বল দিনকাল।

ছাত্র ছাত্রী ভিনরাজ্যে দেননা পাড়ি। পড়াশোনা এখানে যথেষ্ট উন্নত। বিশেষ কিছু ফিল্ডে নতুন দিশা এনেছে বাঙালী মগজ। ইন্তেলেকচুয়ালরা সত্যি বিদ্বান, আঁতেল নন।

সবাই কাজ করেন, সময় মতন। সময় জ্ঞান সবার প্রখর। মানুষের কথা সবাই ভাবেন। পণ প্রথা ও গায়ের রং দেখে বধূ নির্বাচন আজ ইতিহাস। মেয়েরা চলেছে ছেলেদের সঙ্গে পা মিলিয়ে। শ্রমিক ভাইয়েরা আজ পেয়েছেন উপযুক্ত সম্মান। তাঁদের শ্রমের ওপরেই তো দাঁড়িয়ে সমাজ – মুসলিম ভাই বোনেরা হিন্দুদের সঙ্গে ভাগ করে নেন পুজোর থালায় প্রসাদ। নেই দাঙ্গা, রাজনৈতিক উন্মাদনা। এ এক অপূর্ব কলকাতা। এখানে সবাই মানুষ।

সমস্ত বাদ ও পন্থার শেষে আলোর পাখি। মানুষ আজ হাসছে, ভীষণ হাসছে।

ধানশিষের গান শিশুদের মুখে মুখে। এসেছে সবুজ বিপ্লব,

নবরূপে।

জীবনানন্দ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় এসেছেন ফিরে। ভুলেছে মানুষ চটুল যৌন কবিতার কলি। আর কত বলি ?

কলকাতা আজ পরাগরেণু নয় , জীবন্ত ফুলের কলি।

মায়ামাখা , ছায়ানীল পথ ধরে কুয়াশা ভরা প্রাচীন কাছিম - কলকাতা এগিয়ে চলে নতুন যুগের দিকে , চক্রাকারে ---- যেতে যেতে কুড়িয়ে নেয় শিশির বিন্দু -- বসাতে হবে যে তাকে , নির্মল পদ্ম কোটরে।

কলকাতা ২০২৫ , বিজ্ঞান , টেকনোলজি , ওয়্যারলেস দুনিয়ার নতুন ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক প্যারাডাইম। ফাইনম্যান ও কবি জয়ের উত্তরসুরী সবাই এখানে ফাইন।

সোনারঙার চোখ বুজে আসে , ভালোলাগায়। চোখের পাতা বেয়ে পড়ে অশ্রু ----------বেদনার নয় মনে রঙ লাগার। প্রেমিক এক রোবট।

তৈরি করেছেন বাঙালি প্রযুক্তিবিদেরা। এই রোবটই দুনিয়ার প্রথম যন্ত্র মানুষ যে চিন্তা করতে পারে ও পারে হৃদয় উথালপাতাল করা ভালোবাসার নায়ে ভাসতে।

ভালোবাসাই রেখেছে বাঁচিয়ে মানব সভ্যতা। ভালোবাসাই সবকিছুর মূলধন। কলকাতা চিরন্তন , ফাটল ধরেনি তাতে একটু-ও , শুধু শীতঘুমে গিয়েছিলো , তাই ছিলো বাহ্যিক

অনশন , আলোর জটিল সমীকরণ ।

আইনস্টাইন বলেছেন : :: গড ডাজ নট কেয়ার আওয়ার ম্যাথেমেটিক্যাল ডিফিকালটিস , হি ইন্টিগ্রেটস্ এম্পেরিক্যালি । ।।।

সোনারঙা আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বলে ওঠে :

কলকাতা ডাজ নট কেয়ার আওয়ার ম্যাথেমেটিক্যাল ডিফিকালটিস , সি ইন্টিগ্রেটস্ এম্পেরিক্যালি ।

ফুলবনে- গদ্য কবিতা

And I miss you -
Like the deserts miss the rain
And I miss you------!!

এফ এমের গান ভেসে আসে।

নতুন কেনা হন্ডা অ্যাকর্ড জ্যামে আটকে । ব্যাঙ্গালোরে এমনিতেই হিম হিম হাওয়া বয়।

এ-সি অন করেনা দা হিন্দুর সিনিয়র জার্নালিস্ট মেহেক বাত্রা। মাইগ্রেনের অ্যাটাক হয়।

বাতায়ন খোলাই থাকে। বাড়ির পথ অনেকটা।

সিঁদুর লাল ফুলের বাহার।

আকাশ ঢেকে গেছে । বোঝা যায়না আকাশ নীলাভ নাকি

লাল।

সিংহভাগ গাছ পত্রহীন। শুধু ফুলের সমাহার। লালের ও এত শেড হয় জানা ছিলনা মেহেকের।

কোনোটা কমলা লাল কোনোটা গাঢ় লাল কোনোটা একেবারেই মেটে লাল।

মেহেক অবাক হয়ে দেখে প্রকৃতির সৃজনশীলতা, আচ্ছন্ন হয় শিল্পমোহে।

আর চোখ যায় মলিন বাস পরা এক ভিখারিনীর দিকে।

প্রায়ই দেখে তাকে। অপরূপা। গলার এক দিকটা বিশ্রীভাবে পোড়া। চামড়া কুঁচকে গেছে।

ভয়াবহ।

জীর্ণ পোশাক, হাতে ভাঙা বাটি। নাকে ঝকঝক করছে একটি পেতলের নাকছাবি।

মলিনতার মাঝে এক বিন্দু উজ্জ্বলতা, আশা।

মধ্যাহ্নে রাস্তায় থাকলে দেখে, পায়ে পায়ে হেঁটে সে চলেছে কবর খানার দিকে।

এমনিতে রোজ দেখা হয়। সাঁঝবেলায়। অফিস ফেরার পথে। ক্লাব স্যান্ডউইচ খেতে খেতে।

গ্ল্যামারাস ভিখারিনী লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

অদ্ভুত সেই চাহনি।

মেহেক দেখেও দেখে না।

ঝুপ করে সন্ধ্যা নামে সিলিকন নগরের দিগন্তরেখায়।

সেদিন মেহেকের গাড়ি ছিলনা। ভরদুপুরে সে বাসে ফিরছিল।

জায়গা মতন ভিখারিনীর দেখা পেলো। রাস্তা থেকে কিছু ছুঁড়ে দেওয়া অবজ্ঞা কুড়িয়ে নিয়ে পায়ে পায়ে চলেছে কবরস্থানের দিকে।

মেহেক অনুসরণ করে।

সবুজ ঘাসে ঢাকা কবরগুলো। মোরাম বিছানো পথ। খ্রীষ্টানদের মৃতভূমি।

মাঝে মাঝে দু একটি লম্বা ফুলের গাছ হাওয়ায় দোদুল্যমান।

গোলাপী কিংবা সাদা ফুল। নীল ফুল। দুলে দুলে বলতে চাইছে - এই মৃত্যুপুরীতে আমরাও আছি।

শবেরা একা নয়। এখানে কখনো কেউ কেউ মোমবাতি জ্বালে। এখানে সব পথ রুদ্ধ হয়ে যায় না।

বনজ ঘাসের ডগায়।

বেশ দূরে একটা জারুল গাছের নীচে একটি শ্বেতশুভ্র কবর।

ভিখারিনী সেখানে বসলো। একটা আয়না বার করলো

ঝোলা থেকে। তারপর গলার সেই কুঞ্চিত চামড়া আলতো করে টেনে খুলে ফেললো- একটা প্লাস্টিকের আবরণ বোঝা গেল। সেই বীভৎস পোড়া চামড়ার নিচ থেকে নিমেষেই বেরিয়ে এলো গোলাপের পাপড়ির মতন ত্বকের জেল্লা।

মেহেক স্তব্ধ।

আর একটি বই বার করলো। নেড়েচেড়ে খুলে বসলো।

পেছন দিক থেকে ধীরে হেঁটে গিয়ে একদম কাছের একটি বেদীতে বসলো মেহেক।

ঘাসবন বলে পদসঞ্চারের আওয়াজ কর্ণকুহর স্পর্শ করলো না চিরদু:খিনীর।

Death Of A Salesman by Arthur Miller.

চমকে উঠলো মেহেক।

ছায়ারও তো আলো আছে। শয়তানও সংবেদনশীল হয়।

ঘাসফুলেও বসে ভ্রমর।

মন চঞ্চল। কে এই রহস্যময়ী ?

কোন দূর্ভাগ্যের ফেরে ফুলে বিষাক্ত পরাগ ?

মেহেক অনুসন্ধানী।

মেহেক আলোর পিয়াসী।

মেহেক এগিয়ে যায়।

কিছু বিশ্লেষণ, কিছু ভাবনার বাস্তবায়ন, কিছু কল্পনার

আনাগোনা মনের আঙিনায়।

পায়ের শব্দে ফিরে তাকায় কবর কন্যা।

জটা ধরা চুল, নোংরা বেশভূষণ, খালি পা। শুধু এক রাশ আশা ছড়ানো ঐ নাকছাবিটায়।

মেহেককে দেখে, রমণীর পানপাতার মতন মুখে রমণীয় হাসি - দুপুরবেলায় ট্র্যাফিক খুব কম থাকে। এখানে আমি বিশ্রাম নিই।।

মেহেক ও হাসে। জলে নেমে প্রদীপ জ্বালানোর বিফল প্রয়াসের মাঝে শব্দ গুলো হারিয়ে গেছে।

ভিখারিনীর পাশে একটি ঝোলা রাখা। ঝোলায় হাত ঢুকিয়ে বার করে আনে মণিমুক্তো।

একগুচ্ছ পরিপাটি আধুনিক পোশাক। রূপার পায়েল। টাইটানের হাতঘড়ি।

নকল হিরের নাকছাবি। তার দ্যুতিতে আলোময়, গাছে ঢাকা ঈষৎ অন্ধকার কবর স্থান।

আর একজোড়া কোলাপুরি নিপুন চটি।

এগুলো আমার সম্পত্তি - পথচারিনীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর রিন রিন করে ওঠে।

মেহেক চেয়ে আছে - মৌনতা মুখর হয়।

সব ভিক্ষে করে পাওয়া বুঝি ?

ভিক্ষা ? না না ! আমার প্রফেশন জনসেবা নেওয়া। লোকেরা আমাদের মতন অসহায় নগর কন্যাদের জন্য অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকেন তাতেই সব কেনা।আমাকেও তো রোজ এই সময়টা এই রাস্তায় কাটাতে হয়, এটা আমার রুটিরুজি।

ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বার করে ভিখারিনী। মেহেক হাত বাড়িয়ে নিয়ে নেয়।

বৈদেহী গঞ্জালভেজ। ১২৩, অলিভ রোড।

শীতল হাওয়া এসে ছড়িয়ে যাচ্ছে সারা শরীরে। দূরে একজোড়া ছাতিম গাছ। লাল পদ্ম ভরা একটা দিঘি। ভিখারিনি এগিয়ে যাচ্ছে গেটের দিকে। মেহেক নীরবে চেয়ে আছে পথপানে।

আস্তে আস্তে ওর দেহরেখা মিলিয়ে যায় গাছের আবডালে।

কার্ড হাতে কিছুক্ষণ বসলো একটা বেদীতে। তারপর ডুবে গেল চিন্তার পারাবারে।

ভিখারিনী ডুবে গেছে বৃক্ষের কৃত্রিম আঁধারে।

কৌতুহল, অদম্য কৌতুহল। কার্ডের ঠিকানার রেখাচিত্র ধরে মেহেক গেলো

সেই অচেনা পরীর দখিন দুয়ারে।

শহরের দক্ষিণে, লোকালয়ের শেষ প্রান্তে ওর নিবাস।

ঘন গাছপালা ঢাকা এক ফুল বন।

ফুলে ফুলে ঢেকে আছে পথ, চরাচর। আকাশ বাতাস।

ঝরা পাতায় পাতায় মধুর বন মর্মর।

কাঠ গোলাপ, জবা, পপি, ডালিয়া, কাঞ্চনের বন।

স্যামুয়েল গঞ্জালভেজ। নেমপ্লেটে খোদাই করা।

বাড়িটি বাংলো ধাঁচের। পুরাতন, ঈষৎ জীর্ণ।

বড় একটা তেলরঙের শিল্পসুষমা। বাইরের দেওয়ালে আঁকা।

মেহগনি দরজার দুধারে আইভি লতা লকলকিয়ে উঠেছে।

বড় সবুজ সতেজ।

মেহেক ভেতরে ঢুকে যায়।

এক মানব সন্তান এদিকেই আসছেন।

দেওয়াল ধরে ধরে। হাতে একটা লাঠি। বড্ড সোজা লাঠিটা।

আর পেছনে ফুলের সাজে সেই পথচারিনী, আজ নবোঢ়া।

জটা হীনা। একরাশ অপরাহ্নের শিশির ভেজা বকুল ছড়ানো

ভ্রমর কালো অমসৃণ কবরী, ঘাড়ের কাছে।

- মিসেস গঙ্গালভেজ ! হাঁক পাড়ে বাগানের মালাকার।

চন্দ্রমল্লিকার ঝাড়ের পেছন থেকে দ্রুত পায়ে উঠে আসছে, হাতে একগুচ্ছ বনফুল।

লাল ও চন্দনী রঙের বাঁধনি চুড়িদারে ঝলমলে মিসেস গঙ্গালভেজ ওরফে বৈদেহী র ভ্রু পল্লবে ঝিলিক। ঠোঁটে বাঁকা হাসির রেখা।

তাহলে ভিখারিণীর বেশ ? ধুলি ধূসর রূপ ?

ঐ যে আমার পতিকে দেখছেন, উনি দৃষ্টিহীন।

অসম্ভব ড্রিঙ্ক করতেন, এক অমানিশায় গাড়ি দুর্ঘটনায় নিভে যায় চোখের দীপ।

হুইস্কির নেশায় সব গেছে। শুধু থাকার মধ্যে আছে এই বাংলো খানি। তাও অর্থাভাবে বহুদিন সংস্কার না করায় প্রায় ভগ্ন দশা, জরাজীর্ণ।

অনেক কাজের সন্ধান করেছি। কেউ আমাকে একটা ভদ্র চাকরি দেয়নি।

কেউ কেউ দেহলতার মৌতাত নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চেয়েছে আমায়।

- ভদ্রলোকেরাও ? স্নেহেক শুধায়।

- কাকে ভদ্রলোক বলছেন ? বক্র হাসি মিসেস

গঙ্গালভেজের ওষ্ঠে ।

টাই - কোট - প্যান্টুলুন পড়লেই কি ভদ্রলোক হয় ?

আত্মসম্মান, রুচি, বিবেক সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে, রিপুর কাছে আত্ম সমর্পণ করে ক্ষুধার্ত বন্য কুকুরের মতন আচরণ করে । শুধু দেহ নয় ভালোমানুষী তাদের খাদ্য ।

ঢিল মারলেও যায়না, তাড়া করলেও নয় । তাদের পথ ওয়ান ওয়ে । পথে শুধু আসা আছে ফেরা নেই । সেরকম ভদ্রলোকই তো বেশি !

- আপনার আত্মীয়রা ?

- ওরাই তো সবচেয়ে বড় শত্রু ! আপনাকে গিলে খাবার জন্য বসে আছে । বিশেষ করে যদি বিনা পরিশ্রমে পাওয়া রূপের জোরে একটি মালদার লোকের ঘাড়ে চেপে বসতে পারে ।

সমস্ত সুবিধে পেয়ে নিজেদের মনে করে পৃথিবীর সবচেয়ে বোদ্ধা ও চতুর । সবার কাজের, ব্যবহারের ময়না তদন্ত করার দায়িত্ব তাদেরই আওতায় পড়ে । ওপরকে অধম প্রমাণ করে নিজে উত্তম হবার প্রচেষ্টা । এরাই একযোগে ওৎ পেতে থাকে সুযোগের অপেক্ষায় । তারপর নখ দন্ত বার করে সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়ে । আর যখন কোন সুযোগই পায়না তখন অতীত ধরে টানাটানি করে, কবে হাঁচতে গিয়ে কেশে ফেলেছিলেন, কবে নাচতে গিয়ে ঠেংরি ভেঙেছিলেন ।

আপনার চরিত্র হনন করা, কুৎসা রটিয়ে নাম কেনা

এগুলোই এদের ধর্ম।

আর যদি দেখে আপনি আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছেন তখন সব ভুলে সারম্নেয়র মতন এসে পদলেহন করতেও তাদের বিন্দুমাত্র লজ্জা হবেনা। আত্মীয়ের সংজ্ঞা কিন্তু এরকম নয়! এদের সঙ্গে আপনার আত্মার যোগ কোথায়?

শিক্ষায় ছিলাম না সেরা। সাধারণ বড়ই সাধারণ মেধা।

শেষে এই পেশায় নেমেছি।

এই বেশ ভালো আছি।

আমার কাজ ভিক্ষা করা।

ওই বেশবাস আমার প্রফেশন্যাল ড্রেস।

ভুল করেছি বলুন?

কোন ভুল করেছি?

লোক ঠকিয়েছি?

পাপ করেছি?

আকাশ নিভে আসছে। অস্তগামী সুর্যের আভায় সবুজ বনানী গাঢ় হয়ে উঠছে।

মেহেকের হাতে ধরা সেই নেম কার্ডটি।

হাতের চাপে মুচড়ে যাচ্ছে। মেহেক বুঝতে পারছে।

কাগজগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ঝরে পড়ছে অচিন

বাগিচায়।

কার্ডটি নিয়ে সে যে অনেক রোমান্টিকতা লালন করেছিল। রঙীন বেলায়।

গেঁথে ছিল কুড়ানো ফুল দিয়ে

এক মালা, এক সুত্রে

মনের মানচিত্রে।

শ্রাবণ সন্ধ্যা। বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাচ্ছে আউটার রিং রোড।

ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছে হন্ডা অ্যাকর্ডের খোলা জানালা দিয়ে।

মেহেক আজ নীলাম্বরী সাজে সেজেছে।

কবরীতে জুঁইয়ের মালা।

জ্যামে আটকে গেছে যানবাহনগুলি। রাস্তাটকে কেমন দাবার ছক বলে মনে হচ্ছে।

বৃষ্টিভেজা স্নিগ্ধ পথ ধরে এগিয়ে আসে এক রমণী।

মাথায় কাঠগোলাপ। পরণে মাইশোর সিল্ক। কানে ঝুমকো। মুঠিতে এক মধ্যবয়স্ক ,দৃষ্টিহীন মানুষ।

এগিয়ে চলেছে, জাদু কালারের ছাতা। খুব মেপে পা ফেলে হাঁটছে রূপসী। আজও সেই গানটাই বাজাচ্ছে, নাইন্টি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানের রেডিও জকি আভিভা।

I step off the train
I'm walking down your street again and past your door
But you don't live there any more
It's years since you've been there
But now you've disappeared somewhere like outer space
You've found some better place
And I miss you - like the deserts miss the rain
And I miss you - like the deserts miss the rain
Could you be dead?

ব্যাঙ্গালোর শহরে এক ভিখারি আছে যে ভদ্রলোকদেরও টাকা ধার দিতো ও ভিক্ষাকে প্রফেশান হিসেবে নিয়েছে। সেই সুত্র ধরেই এই লেখা।

The End